শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বাঙালী পাঠক

সনৎকুমার নস্কর

বাশুলী- সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বিতর্কগুলি গড়ে উঠেছে রচনাটির নানা প্রসঙ্গকে ঘিরে। বিদগ্ধ পন্ডিত, কাব্যরসজ্ঞ সুধীজন, বিবিধ শৃঙ্খলার সমালোচকবর্গ বিভিন্ন যুক্তি - তর্কে কোন - না - কোন সিদ্ধান্তের দিকে আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'নানা মুনির নানা মত' - প্রবাদবাক্যের সত্যতাটাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জনের কৃপায় যখন গোয়ালঘরের মাচার অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা একটি পুথি প্রথম আলোর মুখ দেখলো, প্রায় তখন থেকেই শু হয়েছিল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষয়ে নানাবিধ গুঞ্জন। প্রথম প্রশ্ন উঠে পড়ল, রচয়িতার পরিচিতি নিয়ে। এতদিন যে - চণ্ডীদাসের গান বাঙালির কানকে তৃপ্তি দিয়ে এসেছিল, এ চণ্ডীদাসের লেখায় সেই ভাব - ভাষা - সুর খুঁজে পাওয়া গেল না। আরও অন্যান্য দিক বিচার করে বোঝা গেল, এ লেখক আলাদা অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী। লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে থাকা কাব্যের ভাষায় এতটা প্রাচীনত্বের চিহ্ন পাওয়া গেল যে, আদি-মধ্যযুগের সাহিত্য - নির্দশন হিসেবে বইটিকে নির্দেশ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। তবুও পরবর্তীকালে কেউ কেউ এর রচনা কাল নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, ভাষায় অন্তর্নিহিত চরিত্র বিশ্লেষণ করে টেনে আনতে চেয়েছেন সতেরো শতকের সীমানায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে নিয়ে আর একটা তর্ক ছিল এর প্রাকরণিক শ্রেণী নির্ণয়কে ঘিরে। বাঁধাধরা কাব্যের আকারে লিখলেও অন্যান্য আখ্যানধর্মী রচনার তুলনায় এ লেখাটা একটু পৃথক। গীতগোবিন্দের কবি জয়দেবকে বাদ দিলে বাংলার আর কোন লেখক বড়ু চণ্ডীদাসের আগে এত দীর্ঘ কাহিনীমূলক রচনা পাঠককে উপহার দেননি। তাছাড়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কাব্যগুণের পাশাপাশি রয়েছে আরো দুটি বিশেষত্ব সঙ্গীতধর্ম ও নাটকীয়তা। প্রত্যেকটি কাব্য - অনুচ্ছেদের পূর্বে লেখক স্বয়ং বিভিন্ন রাগ-রাগিনীর উল্লেখ করেছেন। এতে হয়তো বিশিষ্টতার তেমন কোন লক্ষণ কেউ না - ও খুঁজে পেতে পারেন। কারণ আদিযুগ ও মধ্যযুগের সমস্ত সাহিত্য উপস্থাপিত হয়েছিল গীতরীতির আকর্ষনীয় সুরেলা মাধ্যমে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নাটকীয়তা-গুণের সঞ্চার রচনাটিকে ভিন্নতর স্বাদবিশিষ্ট করে তুলেছে। সংস্কৃতি সাহিত্যের সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্য-স্রষ্টাদের ব্যাপক পরিচয় থাকলেও যে- কোন কারণেই হোক তাঁরা বাংলা বিচার। প্রাসঙ্গিক ভাবে কবির লেখনী ধারণের উদ্দেশ্যটিকেও বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা, দেখবো সামগ্রিকভাবে এ লেখা প্রতিনিধিস্থানীয় হতে পারছে কিনা।

প্রাচীন ভারতবর্ষ একই সঙ্গে সাহিত্য ও সাহিত্য বিচারের তত্ত্ব নির্মাণ করেছে। এ তত্ত্বে ধবনি, রস, ঔচিত্য সমাজপ্রেক্ষিতের বিবেচনা। অথচ ইউরোপীয় সাহিত্যবিচারে জোর পড়েছিল তার সামাজিক উপযোগিতার উপর, যে কারণে প্লেটো মিথ্যাভাষী কবিকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন তাঁর কল্পিত রাষ্ট্র থেকে। ভারতীয় কাব্যতত্ত্বে রসই ছিল কাব্যাত্মাসন্ধানের শেষতম আশ্রয়। এ রসের উদ্ভব স্থায়ীভাবের গর্ভকোষ থেকে। নয়টি রসের মধ্যে আকর্ষণীয় হিসেবে শৃঙ্গার আদিতম, শোকভাব থেকে জাত কণ দাঁড়িয়ে আছে তৃতীয় স্থানে। অথচ বিশেষ দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কণ তেমন ভাবে সাহিত্যের অঙ্গরস হয়ে উঠতে পারেনি। জীবন সম্পর্কে ভিন্নধরণের দৃষ্টিভঙ্গি বোধহয় বড়ু চণ্ডীদাসের নিজস্ব এবং তাকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে তিনি পূর্বাগত কোন ঐতিহ্যের পরোয়া করেননি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের শেষাংশ না পাওয়া গেলেও কাব্যটি যেভাবে এগিয়ে চলেছিল পরিণতির দিকে তাতে মনে হয় রাধাকৃষ্ণের মিলন নয়, বিচ্ছেদেই সমাপ্তি লাভ করতো

এর কাহিনী। অতএব মিলনান্তক পরিণতিতে যে ফল ও আস্বাদন তৈরী হয় পাঠক মনে, এ কাব্যের পাঠক তার থেকে সরে গিয়ে বিপরীতধর্মী কাব্যরসের স্বাদ পেতে পারতেন। খণ্ডিত পুঁথিও সেই চেহারা কম - বেশি এঁকে দেয়। কবির স্পর্দ্ধিত রস - পরিবেশন সেকালে কতটা অভিনন্দন কুড়িয়েছে বলা অসম্ভব হলেও একালে তার মূল্য বোঝেন অনেকেই। এক্ষেত্রে একটা কথা না মনে হয়ে পারে না যে, বড়ু চণ্ডীদাস যে - সমাজ পরিবেশে উদ্ভুত হয়েছিলেন সেখানে সংস্কৃত অলংকার শ াস্ত্রীদের শাস্ত্রবাণী অনুচ্চারিত ছিল। বড়ুর কাব্যের পটভুমি, পরিবেশ, কাহিনী ও চরিত্র পুরোটাই গ্রামীন। গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত মানুষ এর উপভোক্তা। সেখানে বাস্তবজীবনের দুঃখ - বেদনা - যন্ত্রণা প্রকৃত অর্থেই গৃহীত হতো, ত ার ওপর অলৌকিকতা কিংবা আধ্যত্মিকতার আরোপন অপ্রাকৃত বলে গণ্য হতো। বড়ু চেয়েছিলেন গ্রামীন মানুষের অ ানন্দ - বেদনা - সুখ - দুঃখ - নৈতিকতা - দেহাসক্তিকে কাব্যের কাঠামোর বেঁধে দিতে। একজন মানুষের বিরহ - বিচ্ছেদ - মর্মব্যথার উপর কোন আস্তিক্যবাদী ধর্ম ও তৎপ্রভাবসজাত অলংকারশাস্ত্রের বিধান চাপিয়ে দিতে চাননি। যেমনটা চাননি ময়মনসিংহ গীতিকার চাষাড়ে গ্রামীন কবিরা। গীতিকার অধিকাংশ প্রেমগাথারই পরিণতি বিয়োগান্তক বিষাদাত্মক। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ ও রাধার রতি প্রার্থনা আসঙ্গলিপ্সা নিশ্চয়ই এর আদিরসের আধিক্যকে চিনিয়ে দেয়, কিন্তু পরিণতিতে গিয়ে এভাবে আর্তিমথিত কাণ্যকেই স্থায়ীত্ব দেবেন সেটা বোধহয় অনপেক্ষিত ছিল। ঠিক এইখানেই বড়ু আল াদা হয়ে যান তাঁর অন্যতম আদর্শ জয়দেব থেকে। একমাত্র এই কাব্যেই দেখা গিয়েছিল কৃষ্ণের প্রতি রাধার বাম্যতা, যা বৈষ্ণব পদাবলীতে কল্পনাতীত। তত্ত্বের খোলস হয়তো তখনো ধারণ করেনি রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী, কিন্তু ধর্মের অ াচরণধারা ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের অঙ্গ হয়ে যে উঠছিল এই প্রেমগল্প সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। নইলে এর দু'শো আড় াইশো বছর আগে রচিত গীতগোবিন্দে জয়দেব বিলাসকলার পাশাপাশি উল্লেখ করতেন না হরিস্মরণে মন 'সরস' হওয় ার কথা। 'সরস' করা তাঁর পক্ষেও অসম্ভব হতো যদি বাম্যতা দেখানোর পরে তিনি এর মিলনান্তক পরিণতি না টানতেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার বাম্যাতা সামাজিক প্রেক্ষিতাটিকেও চিনিয়ে দেয়। এ কোন অনুরাগিনী নারীর ঈর্ষাকাতর অভিমান নয়, বরং স্বামী সংস্কারে বলীয়ান এক বিবাহিতা রমণীর পর- পুষের আসঙ্গলিপ্সা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান। হায়রে অবোধ নারী। তুমি তো এখন সামন্ততান্ত্রিক পরিবেশে পুষশাসিত সমাজের যুপকাষ্ঠে বলির পাঁঠা। এই সমাজ তোমার মধ্যে সতীত্ববোধ সঞ্চারিত করে দিয়েছে, অথচ তাকে রক্ষা করার মতো কোন শক্তি ও সাহস তোমাকে দেয়নি, রক্ষা করতে পুষও নিজে এগিয়ে আসেনি। অতএব পুষের বলদর্পী কামনার কাছে তুমি হার মেনেছ সহজেই। তোমাকে উপভোগ করে সে সরে গেছে বিনা দ্বিধায় অকাতরে। তাহলে আদিরস নয়, রাধার নিরিখে দেখলে কণ রসই হয়ে ওঠে এ কাব্যের অঙ্গ ীরস - যা সেকালের পক্ষে সত্যি দুঃসাহসিক ছিল। বড়ু এতটা সাহস দেখিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কবিব্যক্তিত্ব ছিল অন্য ধ াতুতে গড়া। প্রচলিত কাব্যপ্রকরণ, ধর্মবিশ্বাস, কাব্যপ্রত্যয় বর্জন করবেন বলে অত্যন্ত সচেতন ভাবেই কলম বাগিয়ে ধরেছেন।

কাব্যের সামগ্রিক রসবিচার ছাড়া আর এক শ্রেণীর রসসংস্কার পাঠককে আকৃষ্ট করে। সে হল পূর্বপ্রচলিত কাহিনীর চরিত্রগত সিদ্ধরস সংস্কার। কৃষ্ণ একাব্যের নায়ক। তাঁর চেষ্টিত (Action) অংশই প্রধান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে ভারতীয় ম ানসে দেবত্বের আসনে আসীন। বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে যেভাবে কৃষ্ণ অভিবন্দিত, তাতে মনে হয় পঞ্চোপাসক হিন্দুর আরাধ্য দেবমণ্ডলীর মধ্যে তাঁরই স্থান সর্বোচ্চে। অবশ্য বিষ্ণুর দ্বাপর যুগীর অবতারী - রূপ হিসেবে কৃষ্ণ ভাগবতেই প্রথম স্থায়ীভ াবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। দ্বিভুজ কৃষ্ণের নানা শিল্পমূর্তি বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এগুলি তাঁর বিপুল সম্বর্ধনার প্রমাণ। বাংলায়পাল - শাসন শুরু হলে সাময়িককালের জন্য পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্রোত স্তিমিত হয়ে পড়লেও সেন - বর্মন যুগে আবার নতুন করে কৃষ্ণারাধনার ধুম পড়ে যায়। এর প্রমাণ রয়েছে সদূক্তিকর্ণামৃতে, কবীন্দ্রবচন সমুচ্চয়ে এবং অবশ্যই গীতগোবিন্দে। ঠিক এই রকম ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণসম্পর্কিত চিরাচরিত রস - সংস্কারের সৌধ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হলো। কবি ভক্তির দেবতার উলঙ্গমূর্তি প্রদর্শন করলেন। ব্রজবিহারী গোপীনাথ ঈশ্বর কৃষ্ণ দেখা দিলেন গ্রাম্য লম্পটের চেহারায় , যার মধ্যে দেহবাসনা ছাড়া অন্য কোন সুস্থ আত্মিক চেতনার স্বাক্ষর পাওয়া গেল না। কাম-লালসাদীপ্ত পুষের ছলা-কলা-আচরণ - উক্তি - হাব - ভাব সবই এই কৃষ্ণের আয়ত্তাধীন। অবশ্য রাধার মন আকৃষ্ট করার সময় কৃষ্ণ বার বার উল্লেখ করে তার ঐশ্বর্য - প্রকাশক ক্রিয়াক াণ্ডের কথা, একবার কালীদহে কালীয়নাগের সঙ্গেও সংঘর্ষে রত হয় সে, অমিত বীর্যে পরাজিতও করে বিষধর সর্পকে,

কিন্তু এ কাব্যের পাঠক জানেন কালীয়-দমন কেবল বীরত্বের প্রকাশচিহ্ন নয়, দহে নেমে গোপীদের সঙ্গে জলকেলিই এ কৃষ্ণের সুগোপন উদ্দেশ্য। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, কৃষ্ণ সম্পর্কে কবির এত খানি অশ্রদ্ধার কারণ কি? তিনি কি কৃষ্ণের অন্তর ালে অন্য কোন বার্তা পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন তাঁর কালের ও ভবিষ্যৎকালের পাঠককুলের কাছে? একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে, তুর্কী আক্রমণোত্তর পর্বে হিন্দুর দেবদেবীরা ক্রমশ মানব - স্বভাব বিশিষ্ট হয়ে উঠেছেন। মানুষের ক্রুরত া, খলতা, নষ্টামি, দুষ্টুমি, আবেগ, ভালোবাসা, করুণা, দয়া এইসব প্রকৃতির দ্বারা কমবেশি চিত্রিত হচ্ছেন। এটা হতে প ারে যে, এই ধরনের মানবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পিছনে সে সময়কার রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক পরিবেশ অনেকখানি দ ায়ী, এবং এই পথ ধরে অগ্রসর হথে পারলে বাঙালি মানস দ্রুত স্পর্শ করতে পারতো মানবতাবাদী আধুনিকতাকে; কিন্তু সাহিত্যের এই ধারাস্রোত উল্টো মুখে বয়ে চললো মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর। তাঁর গণতান্ত্রিক সাম্যাদর্শ, জীবউদ্ধারের প্রতিজ্ঞা, শেষ বারো বছরের দিব্যোন্মাদ অলৌকিক জীবন এমন একটা স্বর্গীয় অধ্যাস সৃষ্টি করলো যে রক্তম াংসের মানুষ পরিণত হয়ে গেছে দেবতায়। যে- কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের ধড়াচূড়া ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিম কামনাময় প্রাকৃত ম ানুষে পরিণত হচ্ছিলেন, তিনি এখন নব বেশে ও ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন শচীগর্ভজাত সন্তান নিমাইয়ের পঞ্চভূতাত্মক দেহে। বড়ুর কাব্য সৃষ্টি এই কারণে অনন্য আর অদ্বিতীয়। তিনি কোন সার্থক উত্তরসুরী রেখে যেতে পারেন নি। তিনি তাঁর উপমা হয়ে বেঁচে রইলেন আজ দীর্ঘ পাঁচ - পাঁচটা শতক।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় প্রসঙ্গটিতে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি অশ্লীল কাব্য - এ জাতীয় অভিযোগ দীর্ঘদিনের। কাব্যে প্রেম কিংব া প্রণয় ঘটিত কিছু বিষয় থাকলেই তা অশ্লীল হয় না, দেখা উচিত সে সব বিষয়ের বর্ণনা পাঠকের মনে ব্রীড়া কিংবা জুগুপ্সা জাগিয়ে তুলছে কিনা। অশ্লীলতা বিষয়ে একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। এটি সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় হলে তা আমাদের চিবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়, কখন নীতিবোধের সঙ্গে নয়। যেহেতু প্রাচীন ভারতবর্ষের কাব্য বিচার স ামাজিক স্বাস্থ্যের মুখাপেক্ষী ছিল না, তাই অশ্লীলতা বলতে অলংকারিকেরা চিদুষ্টিকেই বুঝিয়েছেন, সামাজিক দুর্নীতিকে নয়। অশ্লীলতার মানদণ্ডও আপেক্ষিক - যুগে যুগে দেশে দেশে এর ভিন্নতা আছে। অবশ্য সবশ্রেণীর কাব্যবিশ্লেষকই অশ্লীলত াকে কাব্যের দোষ হিসেবে গণ্য করেছেন। এখন দেখতে হবে, অশ্লীলতা বস্তুটি কি এবং এর অবশান কোথায়? দণ্ডীর মতে গ্র াম্যতাই অশ্লীলতা, তবে এ গ্রাম্যতার মধে ভাল্‌গারিটি কিংবা ইন্‌ডিসেন্সি ভাবটি প্রবল। গ্রাম্যতা যেমন শব্দকে আশ্রয় করে প্রকাশ পায় তেমনি অর্থকেওকখনো কখনো আক্রান্ত করে। অবশ্য দণ্ডী - পরবর্তী আলংকারিক বামনের মতে, গ্রাম্যতা ও অশ্লীলতা বাক্যের পৃথক পৃথক দোষ, যেহেতু অগ্রাম্য শব্দের সহায়তায় যথেষ্ট অশ্লীল বাক্যরচনার দৃষ্টান্ত বাস্তবে লক্ষ্য করা যায়। আসলে অশ্লীলতার লক্ষণ বিষয়ে 'ব্রীড়াজুগুপ্সামঙ্গলাতঙ্কদায়ী' কথাটি বামনই বলেছেন; আর পরবর্তী কাব্যশাস্ত্রীরা ত ার যান্ত্রিক পুনক্তি করে গেছেন মাত্র। কাব্যের অশ্লীলতা বিচার করতে গিয়ে যাঁরা নীতিশাস্ত্রের দোহাই পেড়ে চোখ রাঙানো ার চেষ্টা করেছেন কিংবা দণ্ডদাতা সেজে বসেছেন, তাঁরা আসলে সাহিত্যের স্বাস্থ্য রক্ষার নামে সমাজেরই পাহারাদার হয়ে উঠেছেন। তবে এটা ঠিকই যে, বে - আব্রু পোষাক যেমন মানুষের শারীরিক উপস্থিতিকে অস্বস্তিকর করে তোলে, তেমনি অশ্লীলতা নষ্ট করে কাব্যের রূপ, যে -রূপ রসের নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধারায় সজীব থাকে। ব্রীড়া - জুগুপ্সার মতো ভাব সেই আনন্দময় রসের স্বতঃস্ফুর্ত উৎসারকে বাধ্য দেয় বলে এগুলি অশ্লীলতার লক্ষণ। আর যদি তার রসোৎসারের ক্ষেত্রে কোথাও না প্রতিবন্ধক হয়, তাহলে ঐগুলি মূল রসের পরিবর্ধক সঞ্চারী ভাব হিসেবে কাব্যদেহে সাঙ্গীকৃত হয়ে যায়।

শিল্প- সাহিত্যের অশ্লীলতা - বিচারের মাপকাঠিতে দুটো আলাদা মাত্রা লাগানো- একটি দেশগত মাত্রা, অন্যটি কালগত। ফলে এক সময়ের 'অশ্লীল' চিহিত কাব্য অন্য সময়েশ্লীল' বলে গণ্য হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয় না; অন্যপক্ষে এক দেশ যাকে অশ্লীল বলে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দেয়, অন্য দেশ তার জন্য সংবর্ধনার ডালি সাজাতে পারে। ফরাসি চি যে এই ক ারণে ইংরেজি চির সঙ্গে মেলে না, একথা জানিয়ে ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তেমনি প্রচীন কালের অনেক কাব্যই আধুনিক যুগে কেবল অশ্লীল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে। আরো মজার ব্যাপার, একই লেখকের জীবনের দুই পৃথক সময়ের সাহিত্য ভ াবনায় অশ্লীলতা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী মনোভাবের উপস্থিতি। এখন, কাল ও দেশগত দুই মাত্রা যখন একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন কাব্যবিচারে আরো বেশি বিভ্রাট বাধে। ঠিক যেমনটা ঘটলো ইংরেজি চি দিয়ে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভ ারতীয় রসসাহিত্যের বিচারের ক্ষেত্রে। ইরেজি চি অনেক বেশি রক্ষণশীল, পিউরিট্যানিক। এই শুদ্ধাচারবাদী অতিনৈতিকতাকে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন 'খৃষ্টানি সাধু মনোভাব'। এ মানদণ্ড প্রথমত দেশ -ভিন্নতার দন ভারতবর্ষে না চাল

ানোই শ্রেয়, দ্বিতীয়ত কালপার্থক্যের কারণে মধ্যযুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রে না- প্রযুক্ত হওয়াই ভালো। অথচ এই দুটো অনভিপ্রেত ঘটনাই ঘটলো উনিশ শতকে পাশ্চাত্য তথা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে। এর ফল যা ফলবার সেটাই ফলেছে। বঙ্কিমের মতো বুদ্ধিমান রসিক সমালোচককেও হাত জোড় করে প্রাচ্য আলংকারিকদের বিদায় দিতে হয়েছে এবং রসতত্ত্বের প্রাচীন ভারতীয় ধারার সাহিত্য বিচারের পথ ছেড়ে দিয়ে নব্যধারার প্রতীচ্যের প্যাশানভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্বের বুলি কপচাতে হয়েছে। একই সংকটে পড়ে ছিলেন মধুসুদনও। শুধু মাইকেল-বঙ্কিম নন, উনিশ শতকের পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙালি রসিকের রসভাবনাটা ছিল মোটামুটি এই ধরনের। এঁদের অধিকাংশই অশ্লীলতাকে মাপতে গিয়েছেন বিলেত থেকে আমদানি করা নতুন খৃষ্টানি সাধু মনোভাবের বাটখারায়। ফলে তাঁদের চোখে প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের শৃঙ্গার রসাত্মক অংশগুলি অশ্লীলতার কারণে নিকৃষ্ট। এ জাতীয় সাহিত্য - বিচার সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর অভিমত উদ্ধার করি; 'আমাদের পূর্বপুষদের অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা ইংরেজদের ধারণার সঙ্গে মেলে না বলে যে তা নিকৃষ্ট, এমন কথা মূর্খ ছাড়া আর কেউই বলবেন না। কাব্য সম্বন্ধে সুচি ও কুচি লোকের কাব্যজ্ঞানের উপরেই নির্ভর করে না।' ঠিক এই ঘটনাটিই ঘটেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা বিচারের প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অশ্লীলতা বিচার করার আগে জানতে হবে, কবি কাদের উদ্দেশ্যে কোন্ পরিবেশে এ কাব্য রচনা করেছেন। সাহিত্য - বিচারে বিশুদ্ধ কলাত্মক মানদন্ডছাড়া রয়েছে সমাজতাত্ত্বিক পরিমাপনী - যার তাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠা দিয়ে গিয়েছিলেন ফরাসী সাহিত্যতাত্ত্বিক হিপ্পোলাস তেইন। তিনি প্রত্যেকটি শিল্প - সাহিত্য সৃষ্টির পিছনে তিনটি আবশ্যিক উপকরণের কথা জানিয়েছেনঃ Race(জাতি বা প্রবংশ) Milieu (পারি পার্শ্ব) ও Moment (কালখন্ড)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ অপেক্ষিত। ভারতবর্ষের পুরাণ বা মহাকাব্য খুঁটিয়ে পড়লে যেটা মনকে খুব বেশি ধাক্কা দেয়, সেটা হল গল্পগুলি কম - বেশি যৌনতাগন্ধী। যে কোন কারণেই হোক, ভারতীয় সাহিত্যিকেরা শারীরিকতাকে বেশ বড় মাপের জায়গা দিয়ে ফেলেছিলেন। যার ফলে রসশাস্ত্রের গোড়ায় পেয়ে যাই রতি নামক ভাব ও তার অনুসরণকারী শৃঙ্গার তথা আদিরসকে। 'আদি' রস সত্য সত্যই অন্যেদের তুলনায় অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছে। এ দেশে যৌনতাকেও বিশিষ্ট জ্ঞান - শৃঙ্খলা হিসেবে পাঠ করবার রেওয়াজ ছিল, যার পাথুরে প্রমাণ বাৎসায়ণের কামসূত্র। কৃষ্ণকেন্দ্রিক গল্প পুরাণে কৃষ্ণের দৈবী মহিমার সমান্তরালে তাঁর প্রেমবিলাস তথা যৌনজীবনও যথেষ্ট গুত্ব সহকারে অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি ভাগবতে কেলিকলার নায়ক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে - কবি কৃষ্ণকেন্দ্রিক কাহিনী পাঠককে উপহার দিতে চলেছেন এবং তাঁর ঐশ্বর্যরূপের তুলনায় প্রেমিক রূপটিকেই বেশি করে ফুটিয়ে তুলবেন বলে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন (তাও যে-সে ধরণের 'প্রেমিক' নন, অবৈধ সম্পর্কের প্রেমিক এবং এ প্রেম নিতান্ত দেহসর্বস্ব, সোজা কথায় কাম) তিনি যে কৃষ্ণের স্থূল দেহবাসনার রগরগে চিত্রই আমদানি করবেন এতে আর বিস্ময়ের কি আছে। জাতির বিশেষ বিশেষত্বই বড়ুর কলমে ভাষা পেয়েছে - এ নিয়ে চিৎকার জুড়লে প্রেমমূলক সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যকেও গঙ্গার জলে চুবিয়ে নিয়ে ঘরে তুলতে হয়। এক্ষেত্রে একা বড়ু কবিকে দন্ডিত করা বিচারের নামে প্রহসন। একই সঙ্গে এ কাব্যের পারিপার্শ্বের কথাটাও ভেবে দেখা প্রয়োজন। কবি কোন রাজসভা অলঙ্কৃত করেছিলেন বলে জানা নেই। বরং তিনি যে গ্রামাঞ্চলে বসে কাব্য রচনা করছেন তার প্রচুর কাব্যিক প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর লেখায়। অভিজ্ঞতা বলছে, পঞ্চদশ শতকের গ্রাম একালের তুলনায় আরো বেশি অন্ধকারাচ্ছন্ন, অপরিশীলিত, অভব্য। ধরে নেওয়া যায়, অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিতরাই তাঁর কাব্যের টার্গেট অডিয়েন্স। ভাগবতীর পৌরাণিক কৃষ্ণকথা তাঁরা কতটা জানেন এ নিয়েও হয়তো সংশয় প্রকাশ করা যায়, কেননা ভাগিনেয় - মাতুলানীর অবৈধ প্রেমকথার কোন গল্প ঐ পুরাণের মেলে না। এমনকি রাধা নামের অস্তিত্বও নেই সেখানে। তাহলে কবির অবলম্বন রাধা-কৃষ্ণকে ঘিরে গড়ে ওঠা লৌকিক মুখরোচক গল্প - যার অনবদ্য প্রমাণ রয়েছে দান - নৌকা - ছত্র - ভার - হার - বাণ ইত্যাদি খন্ডের অপৌরানিক উপাখ্যানে। গ্রামের লোকের চি প্রথমাবধি আদিরস ঘেঁসা। গ্রাম্য প্রবাদে, ছড়ায় ধাঁধাঁয় এর সাবলীল অনাবৃত নিষ্কুণ্ঠ প্রকাশ। শিষ্ট সমাজ যে জাতীয় অপার্থ শব্দ কিংবা স্ল্যাংকে ইতরামি বলে নিন্দা করে, ঘৃণা করে বর্জন করে - সে জাতীয় শব্দ গ্রাম্য - লোকের মুখে অবলীলায় কথিত। (স্মরণ কন, ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব বিচার প্রসঙ্গে বঙ্কিমের উক্তিঃ ' সে কালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে - কথা অশ্লীল নহে, তাহা সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না।' বঙ্কিম কথিত ' সে কাল ' তো বড়ু কবির কাল থেকে আরো প্রায় চারশো বছর আধুনিকতার দিকে এগিয়ে এসেছিল - তবু তখনো এই অবস্থা!) ফলত এই ধরনের পারিপার্শ্বের চাপ বড়ুকে স্বীকার করে নিতে হয়েছে এবং তিনি তৎকালীন লে

াকচির অনুগত করে কাব্য বানাতে গিয়ে শিষ্ট লোকেরশ্লীল- সংস্কারের দ্বারা পীড়িত হননি। এজন্য আজ আমরা যখন শহুরে মানসিকতা দিয়ে, খৃষ্টানি সাধু মনোভাবের বাটখারায় কাব্যটি ওজন করতে যাই তখনই হোঁচট খাই। হোঁচটের অ াঘাতটাকে আরো অসহনীয় করে তুলেছে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর পরিকরবৃন্দ কর্তৃক প্রচারিত বিশিষ্ট রাগাশ্রয়ী ভক্তিবাদী দর্শন- যার ছিটে - ফোঁটাও পাওয়া যায় না শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। কাব্যটি যে চৈতন্য পূর্ববর্তী কালের রচনা এটাও তার একটা বড় প্রম াণ। তেইন - কথিত তৃতীয় উপকরণটি হল কালখন্ড বা সময়। সাহিত্যের ওপর সময়ের প্রভাব গুতর। এজন্য নিরবচ্ছিন্ন স াহিত্য সৃষ্টির ধারাকে আমরা যে নানান যুগে বিভক্ত করে ঐতিহাসিক পর্যালোচনা করে থাকি, সেই যুগ - বিভাগের প্রধ ানতম ভিত্তি হয়েছে এই সময়। যদিও পঞ্জিকার সাল - তারিখ - বারের অনুপুঙ্খ দিয়ে যুগবিভাজন অনাবশ্যক ও অসম্ভব, বরং রবীন্দ্রনাথ - কথিত 'মর্জি' - টাকেই মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা সঙ্গত। বড়ু চন্ডীদাসের রচনাটির কাল ভাষাগত প্রমাণের দুটো কথা বলা যেতে পারে। প্রথমত, এ কাব্যের ভাষার গায়ে আদি- মধ্যযুগের ব্যাকরণিক চিহ্ন এত বেশি আঁটো - সাঁটো হয়ে আছে যে, তা পরবর্তীকালের কোন হস্তকুশলীর পক্ষেও হয়তো সচেতনভাবে লাগিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। ত াছাড়া ভাষা যেখানে এতটা এগিয়ে এসেছে বিবর্তনের ধাপ বেয়ে, সেখান থেকে উল্টো পথে ফিরে গিয়ে দেড়শো দু'শো বছরের পুরনো ভাষায় একটা ঢাউস মাপের কাব্য রচনা করাও সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। যিনি এটা করতে যাবেন, তাঁর পক্ষে বরং সহজ কৃত্য হবে তাঁর সময়ের ভাষায় এত উন্নতমানের কাব্য রচনা করা। এই সহজ সিদ্ধির পথ ছেড়ে কেন একজন সত্যকারের ক্ষমতাপন্ন কবি অন্যের নামে (ইংরেজ কবি চ্যাটার্টন ও বাঙালি কবি রবীন্দ্রনাথের ছদ্ম নামের আড়ালে আত্মগোপনের কথা মনে রেখেও বলছি) কাব্য রচনা করতে যাবেন, তার কোন জবাব নেই সংশয়ী পন্ডিতদের লেখায়। ব াহুল্য বোধে সেই অজ্ঞতা প্রতারকের বাংলা ভাষার ঐতিহাসিক বিবর্তনসমৃদ্ধ তুলনামূলক পাঠশিক্ষার কথা এখানে না হয় ছেড়েই দিলাম। দ্বিতীয়ত, যে -সব শব্দে আধুনিকতার গন্ধ পেয়েছেন কালবিষয়ে সন্দিহান পণ্ডিতবর্গ, তাঁদের ও ভেবে দেখা দরকার এ গ্রন্থে আরবী - ফারসী শব্দের বিস্ময়কর ন্যূনতার দিকটি। মাত্র চারটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে ঐ ভাষা - ভান্ড ার থেকে। অথচ পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলিতে তো বটেই সংস্কৃত থেকে অনুদিত গ্রন্থেও আরবী - পারসী মূল বাংলা শব্দের অন্যূন ব্যবহার চোখে পড়ে। প্রশ্ন জাগে, হাত সাফাইয়ে পটু জালিয়াত কি এত সময় - সচেতনতার পরিচয় দিতে সক্ষম হলেন সে - যুগে এবং তিনি কি অগ্রিম ভেবে নেবেন যে, একদিন তাঁর নকল গ্রন্থ নিয়েআগামী কোন শতকের সা হিত্য - জহুরীরা ভাষায় কষ্টিপাথরে এর মেকিত্ব যাচাইয়ের জন্য এতটা ঘর্মজল নিঃসৃত করবেন।

যদি উপরোক্ত যুক্তির বলে ধরে নেওয়া যায়, এ কাব্যের জন্ম পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে তাহলে রচনাটির অশ্লীলতা বিচারে সময়ের প্রভাব নিয়ে দু'একটা ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে। তবে সেই সঙ্গে এটাও খুব সত্যি যেশ্লীল- অশ্লীল ব্যাপারটি আদৌ সময়ের উপর নির্ভরশীল নয়। মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্রই এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। প্রায় - আধুনিকতার দ্বার প্রান্তে দাঁ ড়িয়েও এই কবিকে বিদ্যাসুন্দরের অবাধ মিলনের জুগুপ্সা - পূর্ণ দৃশ্য অলংকৃত ভাষাছাঁদে আঁকতে হয়েছিল। তবুও কৃষ্ণের মতো হিন্দু সমাজের

প্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক দেবতাকে নিয়ে অশ্লীল রসাত্মক কাব্য গড়ে তোলার পিছনে সময়ের কতদূর সদর্থক ভূমিকা ছিল সেটা খতিয়ে দেখা দরকার। দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়দেবই প্রথম রাধা ও কৃষ্ণের শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তৃত আকারের রচনা ফঁ াদলেন, যদিও সেখানে সম্পর্কটি মাতুলানী ভাগিনেয় নয়। তখনো বাংলায় হিন্দু রাজত্ব বহাল তবিয়তে রয়েছে এবং পৌর াণিক সংস্কৃতিরও বাড়বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। কৃষ্ণ তখন একই সঙ্গে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা ও উদ্দাম কামকলার ধৃষ্ট নায়ক। ক াব্যের মধ্যে কৃষ্ণের এই দ্বিবিধ মূর্তি জয়দেব স্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন একটি প্রারম্ভিক শ্লোকে। (স্মর্তব্য ঃ 'যদি হরিস্মরণে সরসং মনো যদি বিলাস কলাসু কুতুহলম্.....) এমন কি কবির মধ্যেও ভক্তির গাঢ় প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় দশ াবতার বন্দনায়। কিন্তু বড়ু কবির সম্পর্কে এর কোন কথাই খাটে না। স্মরণীয়, বড়ুর আবির্ভাব যে - কালে সে - সময়টার একটা রাজনৈতিক বিশিষ্টতা আছে। ততদিনে পাল্টে গেছে রাংলাদেশের রাষ্ট্রনৈতিক প্রেক্ষাপট, বিধর্মী প্রশাসকের হাতের মুঠোয় নিপিষ্ট হচ্ছে এদেশবাসীর জীবন, বিচূর্ণিত মঠ - মন্দির, দেবতার শিলাময় বিগ্রহ যে নিছক পাষাণের স্তূপ দেবমূর্তি ধবংসের তাণ্ডবলীলায় সেটাই প্রমাণ করছিল ইসলাম অনুসারকেরা। বিপরীতধর্মী ধর্মবিশ্বাসের আঘাতে এইভাবে সেন অ ামলের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুসজ্জিত সৌধ ক্রমশ ধবসে পড়তে থাকে। প্রসারণশীল হিন্দুসমাজ এবার আত্মরক্ষায় তৎপর হল। মঙ্গলকাব্য কিংবা অনুবাদ সাহিত্যগুলো গড়ে ওঠার পিছনে হিন্দুর এই আত্মরক্ষার সাহিত্যিক প্রয়াসটিই বড় হয়ে

দেখা দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই প্রয়াস, আশ্চর্যজনকভাবে, উল্টো মুখে প্রবাহিত। এর পিছনে অন্যবিধ কারণ লুকিয়ে ছিল বলে মনে হয়। কাব্যটিকে কখনই অনুবাদ কাব্যের মর্যাদা দেওয়া যায় না, অথচ জন্ম খণ্ডে ও অন্যত্র কোথাও কোথাও বিভিন্ন পুরাণ - বচন উদ্ধৃত করে কবি তাঁর বর্ণিত গল্পের সঙ্গে পৌরাণিকতার একটি প্রচ্ছন্ন যোগ রেখে যান। এটিও তাঁর বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেছে। বাংলাদেশে কৃষ্ণ-কাল্টের ধারাবাহিক বিবর্তনের দিক থেকেও দেখা যাচ্ছে, ভাগবতীয় কৃষ্ণ পঞ্চদশ শতকের প্রথমার্ধে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের তত্ত্বে পরিণত হতে পারেননি। এমনকি ঐ শতকের শেষ পাদের কবি মালাধরের লেখায় কৃষ্ণ সম্পর্কে জানমানসে যতটুকু ঐশ্বর্যভক্তি ও দৈবধারণা সঞ্চারিত হতে পেরেছিল এ সময়টায় ঐ ধরনের কবি - ব্যক্তিত্বের অভাব থাকায় সেটুকু সাহায্যও মেলেনি। হিন্দুর সাংস্কৃতিক সংকটের এই সন্ধিক্ষণে বড়ু চণ্ডীদাসের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছিল কৃষ্ণের ঐশী মাহাত্ম্য হননকারী এক অদ্ভুত রূপবন্ধাত্মক রচনা - যার পাতায় পাতায় কৃষ্ণ দেহবাসনার উষ্ণ নিঃশ্বাস ছড়িয়ে তাঁর দৈবী শ্রদ্ধেয় মূর্তিটাকে নিজেই ভেঙে দিয়ে গিয়েছেন। জানি প্রশ্ন উঠবে, একজন হিন্দু কবি হিসেবে সংস্কৃতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বড়ু চণ্ডীদাসের কি কোন দায়বদ্ধতা ছিল না? সে পথে পা না বাড়িয়ে তিনি কেন বিধর্মী - সুলভ ধর্মনিন্দার পথ বেছে নিলেন? তাঁকে কেন ঘর শত্রু বিভীষণের ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল সেদিন? এসব প্রশ্নের জবাব কাব্যের অভ্যন্তর ভাগে ইঙ্গিতের আকারেই লুকিয়ে আছে। সেখান থেকে দু'একটা কথা তুলে আনা যাক। প্রথম, প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণব ধর্মের কাছে বড়ু কবির কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। 'বাশুলী সেবক' - এই অভিধাটিই চিনিয়ে দিচ্ছে তাঁর নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসকে। শাক্ত - বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব হিন্দুধর্মের উপমতগত দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে বিশিষ্টতম। বড়ুর কালে অর্থাৎ চৈতন্য - পূর্ব যুগে বাংলায় এই দুই পৃথক মতাবলম্বীদের মধ্যে যে সাপে - নেউলে সম্পর্ক ছিল, সেকথা জানা যায় বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত থেকে। ফলে শাক্তমতে বিশ্বাসী কবি যে বৈষ্ণবের আরাধ্য কৃষ্ণকে খুব একটা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন না, সেটা বলাই বাহুল্য। এরই ফলশ্রুতিতে কাব্যের মধ্যে কোথাও কবির নিজস্বভক্তি নিবেদনের চিহ্ন মাত্র মেলে নি। কৃষ্ণের দেবত্ব কেবল দম্ভোক্তির আকারে তাঁর মুখেই প্রকাশিত - যার একমাত্র উদ্দেশ্য মিলনে অনিচ্ছুক রাধাকে সম্মত ও করায়ত্ত করা। কবির হয়তো মতলব ছিল, কৃষ্ণভক্তদের আরাধ্য দেবতাটিকে কালিমা-লিপ্ত করে তাঁদের ধর্মাচারকে হেয় প্রতিপন্ন করা - যা কিনা সবদেশে সব কালে ধর্মমতাদর্শজাত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রকাশের একটা বিশিষ্ট ধরন। এই কাব্যেও কৃষ্ণের লম্পট মূর্তিকে এঁকে সেকালের নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবকুলকে দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁদের পরম বন্দনীয় দেবতাটির আসল রূপ, ঐশী - মুখোশের অন্তরালে লুকিয়ে থাকা কামলালসাপূর্ণ বীভৎস মুখশ্রী। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে তাই ধর্মীয় বিদ্বেষ বিষ উদ্‌গীরণের শোচনীয় কাব্য পরিণাম হিসেবে দেখা বেশি সঙ্গত। ফলে কাব্যটিতে অশ্লীলতার কালিমা যদি কিছুটা লেগে থাকে সে কবির উপরোক্ত বিশেষ মনোভঙ্গির ফল। বিশেষত রাধা ও কৃষ্ণের মিলন দৃশ্যগুলিতে যে - প্রত্যক্ষতার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তা যথেষ্ট ব্রীড়া ও জুগুপ্সাব্যঞ্জক। সে - বর্ণনায় সেকালের গ্রাম্য বাঙালি পাঠক আমোদ পেলেও শিক্ষিত শহুরে মানসিকতা - সম্পন্ন বাঙালি পাশ্চাত্য সাহিত্যাদর্শে কাব্যটির অংশবিশেষকে অশ্লীল বলে চিহ্নিত করেছেন।

এবার তৃতীয় তথা সর্বশেষ প্রসঙ্গঃ কৃষ্ণ চরিত্রের কলঙ্ক-বিচার। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ নীতিবাগীশ মানুষের চোখে কলঙ্কিত নায়ক। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দুটি দিক থেকেঃ ১ সে এমন একজন রমণীর সঙ্গে দেহসম্পর্ক গড়ে তুলেছে, যে নারী সামাজিক - সম্বন্ধে তার মাতুলানী অর্থাৎ গুরুজন। স্মৃতিশাস্ত্রের নীতিতে এটি 'অগম্যাগমন' - যা কেবল কলঙ্কই নয়, পাপ বলেও স্বীকৃত। ২. মানবতার নীতিতেও কৃষ্ণ কঠোর সমালোচনার যোগ্য। কেননা একজন অপ্রাপ্ত - বয়স্কা বালিকাবধূর অসম্মতিকে অগ্রাহ্য করে সে শারীরিক ভাবে বলপ্রয়োগ করে এবং পরে সেই নারীর মধ্যে দেহ তথা প্রেমচেতনা (?) জেগে উঠলে হাস্যকর কারণ দেখিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। এটি মানবিক দিক থেকে অমার্জনীয় অপরাধ। স্বার্থ ফুরানোর পর নিজেকে এভাবে সরিয়ে নিয়ে কৃষ্ণ বিপুলভাবে সমালোচিত হয়েছে। কৃষ্ণ চরিত্রের বিতর্কিত এই দুটি দিক এখানে পর্যায়ক্রমে আলোচিত হল।

ভারতীয় স্মৃতিশাস্ত্রে কতকগুলি ক্ষেত্রে যৌন সংসর্গকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং এই বিশিষ্ট মূল্যবোধ এক অর্থে ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক। যে -সকল স্ত্রীলোকের সঙ্গে যৌন সম্বন্ধ পাপজনক বলা হয়েছে , তার মধ্যে গুর্বঙ্গনাই প্রধান। এই শ্রেণীর মধ্যে জননী, বিমাতা, ভগিনী, কন্যা, আচার্য-কন্যা, আচার্যানী প্রভৃতি সম্পর্কের নারীরা অবস্থান করে। রাধা সামাজিক সম্পর্কে কৃষ্ণের মাতুলানী বলে কথিত। মাতুলানী- ভাগিনেয়কে ঘিরে নানারকম মুখরোচক গল্পগাথা গড়ে

উঠেছিল এককালে, যার পিছনে কোন লোকসমাজের প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। যে - কারণে কেবল রাধাকৃষ্ণকে ঘিরেই নয়, চণ্ডী ও নারদকে ঘিরেও এমনি অশ্লীল রসিকতার দেখা মেলে লোকসমাজে। দ্বিতীয় সম্পকটির কথা পাওয়া যায় নারায়ণ দেবের পদ্মপুরাণে। যাইহোক, পৌরাণিক আখ্যানে দেখা যাচ্ছে, রাধার স্বামী আইহন কৃষ্ণের পালিকা-মাতা যশোদার সহোদর। এদিক থেকে দেখলে আপতিক ভাবে রাধাকৃষ্ণের যৌনসম্বন্ধ পাপজনক - যা মৌখিক রসিকতাকে ছাড়িয়ে আরো গভীরে প্রবেশ করেছে। দানখন্ডে কৃষ্ণ দানী সেজে নানা ছলে রাধার দেহপ্রার্থনা করলে রাধা বারবার এই সম্বন্ধের কথা তুলে পাপভীতি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছে। যেমন ঃ ' না বোল না বোল কাহাঞি হেন পাপ বাণী', 'গু পাপে বেঢ়িলের আলপকালে', 'পুরান আগম বেদ করহ বিচার/ দেখ যত পাপ হয় কৈলে পরদার', 'তোহ্মার মাউলানী আহ্মে শুন দেবরাজ / এ বোল বুলিকে কাহ না বাসসি লাজ।' এ 'লাজ' যে সামাজিক লজ্জা তাতে কোন সন্দেহ মাত্র নেই । অন্যদিকে 'পরদারে উদ্‌গত মতি' কৃষ্ণ সম্পর্কটিকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করতে চায়। সে যশোদার পরিচয়ে পরিচিত হতে চায় না, বরং জানিয়ে দেয় 'বাপ বসুল মোর 'মাতা দেবকী' আর 'মামা কংসাসুর'। ফলে গোয়ালিনী রাধা তো কৃষ্ণের ' সোদর মাউলানী' হতে পারে না; অতএব কৃষ্ণ রাধাকে বলে, ' তোমার সম্বন্ধ কথা আনেক দূর'। মিলনের পক্ষে বিঘ্নজনক ভাগিনেয় - মাতুলানী সম্বন্ধের কথা যারা বলে কৃষ্ণ তাদের প্রতি কোপাবিষ্ট। ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে কটুক্তি করে - 'দুই আখি খাউ পড়ুক তার কন্ধ'। এই সুবাদে সে রাধার সঙ্গে নতুন সম্পর্ক ঘোষণা করে দেয় ঃ 'নহসি মাউলানী রাধা সম্বন্ধে শালী'। আর 'শালী' হলেই সম্বন্ধের অধিকার বেশি করে খাটানো সম্ভব কৃষ্ণের পক্ষে। রাধা যখন দেখলো গুজন - সম্পর্কের কথা তুলেও কৃষ্ণকে নিরস্ত করা যাচ্ছে না, তখন সে ভয় দেখিয়েছে কংসাসুরের, নিজের স্বামী 'বীর' আইহনের। কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করতে চেয়েছে তার রাখালীবৃত্তির কথা তুলে। তবুও কামবিবশ কৃষ্ণকে নিৎসাহিত করা সম্ভব হয় না। দানখণ্ডেই কৃষ্ণ অনিচ্ছুক রাধাকে বলাৎকার করে। এর পর বলিষ্ঠ পুষের স্পর্শে ক্রমশ রাধার ভেতরেও চলে ভাঙাগড়া সরে যায় তার কৃষ্ণবিমুখতা, হয়ে ওঠে সে কৃষ্ণ - অনুরাগিনী এক নারী। কৃষ্ণের জন্যই রাধা তাহলে নিজের ভেতরের আর একটি সত্তাকে খুঁজে পেল, দেহতৃপ্তির পথ ধরে তার ভেতরে জেগে উঠলো দেহাতিশায়ী প্রেমবোধ, নইলে কালীয়দমন খন্ডে মুমূর্ষু কৃষ্ণকে দেখে লোকলজ্জার মাথা খেয়ে সর্বসমক্ষে বলে উঠতো না - 'পরাণ পতী/ মোক ছাড়িঞা কাহ গেলা কতী।' রাধার কাছে তাহলে সামাজিক সম্বন্ধটি প্রধান প্রতিবন্ধক, আর আপত্তির দ্বিতীয় কারণ রতি - অনভিজ্ঞতা। এজন্য প্রথম মিলনের পূর্বে সে কাতর মিনতি করে কৃষ্ণের কাছে - 'মাথার মুকুট কাহাঞি ভাঁগি জুনি জাএ..... ' ইত্যাদি। এর পাশাপাশি ভোগের বাহ্যিক চিহ্ন থাকলে স্বামীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ও তাকে বিহ্বল করে তুলেছিল। আসলে সমাজের অনুশাসনে শাসিতা হিন্দুনারীর যেমন ধরনের স্বামী - সংস্কার থাকা উচিত রাধারও সেটা ছিল এবং এই জন্যই সে প্রথম পর্বে পাপের কথা জানিয়েছে। সামাজিক পরিপ্রেক্ষণীতে বিচার করলে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্যায় কর্ম করেছে, কিন্তু সে এ কর্মে অগ্রসর হতে গিয়ে বারবার বিগত দেবরূপের কথা টেনে এনেছে। বিষ্ণু ও লক্ষ্মী দুইজনে মর্তে কৃষ্ণ ও রাধা হয়ে জন্মালেও লক্ষ্মী যেমন পূর্বের স্বরূপ ভুলে যান, বিষ্ণুর ক্ষেত্রে তা ঘটে না। আর এই দু'মুখো ব্যাপার ঘটে বলে রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গল্পটা দ্বন্দ্বময় হয়ে ওঠে, রাধা আক্ষরিক অর্থে বাম্যতা দেখায় কৃষ্ণমিলনের ব্যাপারে। অথচ বিষ্ণু পুর্বস্বরূপ বিস্মৃত হল না বলেই কৃষ্ণরূপের যুক্তিসঙ্গত ভাবে দাবী করতে থাকেন রাধার দেহভোগের। এখন বিচারটিকে যদি রাধার বিস্মৃত সত্তার দিক থেকে করা যায় তাহলে কৃষ্ণ অবশ্যই কলঙ্কিত নায়ক এবং অগম্যাগমনের সূত্রে পাতকী; আর প্রেক্ষণবিন্দুটি যদি কৃষ্ণের দিকে রাখা যায় তাহলে সে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হল না, স্বকীয় পত্নীর সঙ্গে স্বাভাবিক বিহারে রত হল, ফলে কলঙ্ক কিংবা পাপের কথা সেখানের বোধহয় অবান্তর - অন্তত সেকালের দাম্পত্য - সম্পর্কের নিরিখে।

বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে চরিত্র হিসেবে রাধার প্রাধান্য ও ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট হলেও কবি কাব্যের নাম রেখেছিলেন কৃষ্ণের নামে - তা সে কাব্যের প্রকৃত নাম 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-ই হোক বা 'শ্রীকৃষ্ণসন্দবর্ব'-ই হোক। অনেকের মতে, 'কীর্তন' শব্দটি প্রতিমুহূর্তে কৃষ্ণকেই ব্যঙ্গ করেছে। আর এ ব্যঙ্গ যে কবিরই সচেতন শব্দ প্রয়োগের ফল, সে কথা বোধহয় এখন না বলে দিলেও চলে। চরিত্রটিকে বিদ্রুপে বিদ্ধকরতে চেয়ে কবি কৌশল করে কৃষ্ণের এমন দুটি পরিচয় তুলে ধরেছেন যারা পরস্পর- বিরোধী। কৃষ্ণ নিজেকে দেখতে চাইছে পরম পুষ বিষ্ণুর অবতার হিসেবে, অথচ এমন ধরনের আচরণ করছে যা গ্রাম্য লম্পটের পক্ষেই মানানসই। এরকম দেহলালসাদীপ্ত নিতান্ত গ্রাম্য যুবক কেবল গোপসমাজ কেন যে কোন সমাজেই বিরাজ করে। এখন, দেবত্ব ও লাম্পট্য - এই দুটি রূপ যখন একটি দেহে সমীকৃত হয় তখন পাঠকের সিদ্ধ রসাশ্রিত

পুরনো ভাবনায় ধাক্কা লাগে। আমরা দেবতার চটুল দেবত্বে আঁৎকে উঠি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা ভুললে চলবে না যে, দৈবপ্রেমের জৈব প্রকাশও স্বাভাবিক ঘটনা - অন্ততঃ ভারতবর্ষীয় পুরাণগুলিতে এর আকছার উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। দেবতা হয়েও লাম্পট্য করে বেড়াচ্ছেন এমন দৃষ্টান্ত আরোও আছে। দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক গৌতম - পত্নী অহল্যা ভোগের কথা স্মরণ কন। যোগীন্দ্র শিবও কখনো কখনো রূপসী কিংবা কচুনী নারীর প্রতি আসক্তি বোধ করেছেন। কৃষ্ণ তাহলে একা এ পথের পথিক নন। তবে কৃষ্ণের ক্ষেত্রে সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নটা উঠে পড়েছে, যেহেতু অবৈধ মিলনের ঘটনাটা স্বর্গলোকে না ঘটিয়ে ঘটানো হয়েছে মর্ত্যালোকের বাস্তব সংসারে। বিবাহিতা রাধা যেখানে সমাজের প্রচলিত রীতি - নীতি - সংস্কার - বিশ্বাসে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলেছে। এ হেন সামাজিক চেতনা - সমৃদ্ধ রাধা যে প্রথম থেকে কৃষ্ণের মতো পরপুরুষের সঙ্গে মিলনে অনিচ্ছুক হবে এতো সামাজিক কারণে স্বাভাবিক কথা। তবুও লালসাদীপ্ত কামুক কৃষ্ণের হাত থেকে নিজের শরীর বাঁচিয়ে রাধা চলতে পারেনি। ক্রমশ ঘৃণ্য মিলনে জাগলো মধুর দেহচেতনা, সে হয়ে উঠলো কৃষ্ণোৎসুক। এর পর কৃষ্ণ গড়ে - ওঠা - সম্বন্ধ নানা ছলে চুকিয়ে দিতে চেয়েছে। এ জাতীয় বিচারে কৃষ্ণ নিশ্চয়ই মানবিক কারণে অপরাধী এবং এই অমার্জনীয় অন্যায়ের জন্য সে সমালোচক মহলে 'মানবিক গুণবর্জিত নিতান্ত গ্রাম্য বর্বর স্থূল দেহলোলুপ কুটিল' চরিত্র হিসেবে ভর্ৎসনা পেয়ে এসেছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পটির সামাজিক পরিবেষ্টনী বিচার করলে এ ভৎসনা কৃষ্ণের যথার্থই প্রাপ্য। কিন্তু রাধাকেও যাঁরা দেহাতিক্রমী প্রেমের আধাররূপে বিবেচনা করে এ জাতীয় নৈতিক ফতোয়া দিতে চেয়েছেন তাঁদের কাছে রাধার স্বরূপটাও পরিস্ফুট করা যাক। দানখন্ডে কৃষ্ণ সত্যসত্যই বলপ্রয়োগ করেছিল, নৌকাখন্ডে সামান্য কৌশলেই লাভ করলো রাধাসঙ্গ; পরবর্তী ভার ও ছত্রখন্ডে চতুরা রাধা কৃষ্ণের দুর্বলতা বুঝতে পেরে সুরতি দানের লোভ দেখিয়ে তার দই - দুধ বইয়ে নেয়, তার ছত্র বহন করায়। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায়, দান ও নৌকা খন্ডে রাধা বলাৎকৃতই হয়েছিল, তাহলে অন্যান্য খন্ডগুলিতে ধর্ষিতা রাধার আচরণকে কি বলা যাবে? কোন্ চোখে দেখবো আমরা রাধাবিরহের বিপরীত বিহারকে? অভিজ্ঞতা বলে, ধর্ষিতারা কখনই বারবার এ হেন ঘৃণ্য অন্যায় মিলনকে প্রশ্রয় দেয় না, কামনা তো দূরের কথা। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এইরকমঃ দেহমিলনে এক অনিচ্ছুকা বিবাহিতা নারীর যে ধরনের শরীর সংস্কার থাকা সম্ভব রাধার মধ্যে তা প্রথমাবধি ছিল, পরে কোন এক ধৃষ্ট পুরুষের লজ্জাহীন বলপ্রয়োগে সেসংস্কার ঘুঁচে যায়। পরিবর্তে দেহসুখের আলাদা একটা স্বাদ পায় রাধা। এই লোভেই সে ঘর ছাড়ে, সংকোচ ত্যাগ করে, সতীত্বের বোধ মন থেকে মুছে ফেলে। ক্রমশ সে হয়ে ওঠে পরপুরুষের প্রতি অনুরাগিনী এক কামনাময়ী নারী। পন্ডিতেরা একে বিবেচনা করেছেন রাধার সর্বত্যাগী দেহাতিক্রমী প্রেম হিসেবে, যা দেহকে অবলম্বন করে সূচিত হলেও ব্যক্তিগত বেদনার স্তরে সীমাবদ্ধ নয়। 'সে বেদনার সুর ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের সর্বদেশের বিরহ - বেদনার সুরের সহিত মিলিত হইয়াছে।' এ জাতীয় প্রেমাদর্শের কথাশুনতে খুব ভাল লাগে, কিন্তু কাব্যের কষ্টিপাথরে বিচার করলে এ যে রং চড়ানো মেকি বিবেচনা সেটা একটু সত্য দিয়ে যাচাই করলেই বোঝা যায়। পণ্ডিত - মহলে এই এক রীতি প্রচলিত যে, খ্যাতিমান কার মন্তব্য বিনা বিচারে উত্তরসূরী কর্তৃক আউড়ে যাওয়া। এতে সুবিধা আর অসুবিধা দুইই আছে। এতে যেমন পরবর্তী ভাবকের নতুন কিছু চিন্তা করার দায়টা দূর হয়, তেমনি পুরনো একটা কথা বারবার উচচারিত হতে হতে মতটা জগদ্দল হয়ে চেপে বসে। এমতাবস্থায় কোন বলিষ্ঠ নতুন কথার ভাগ্যে জোটে কেবল সংশয়ের ভ্রূ - কুঞ্চন ও অপরিচিতের লাঞ্ছনা। সেসব সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেও বলি, বৈষ্ণব পদাবলীর রাধার ক্ষেত্রে যদিও বা কিছুটা দেহাতিক্রমী প্রেমের লক্ষণ দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধার আদৌ সে - সবের কোন নাম - গন্ধ নেই। প্রমাণ বড়াইয়ের উক্তি, প্রমাণ কৃষ্ণের বিদ্রুপ, প্রমাণ রাধার নিজের আক্ষেপ। পরিস্থিতিটি ছিল এই বাঁশী ফিরে পেয়ে কৃষ্ণ রাধার প্রতি বাম হয়ে বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরায় গেলো কংস - হত্যা করতে। এদিকে রাধা কৃষ্ণ অদর্শনে উন্মত্তা হয়ে বারবার বড়ায়িকে কৃষ্ণ আনয়নের জন্য অনুরোধ করতে লাগলো। বড়ায়ি বুঝেছিল তার এই সুগভীর আর্তির পিছনে কিসের উদ্‌বেজনা। তার অভিজ্ঞ চোখ ঠিকই ধরে ফেলেছে রাধার মনোগত অভীপ্সাটি। যে - রাধা এককালে কৃষ্ণের মিলন - প্রস্তাব দু'পায়ে ঠেলেছে, অপমান করেছে তাকে, সেই রাধাকে এবার বড়ায়িও আঘাত দিয়ে বলেঃ 'এবেঁ ঘুসঘুসাআঁ পোড়ে তোর মন/ পোটলী বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন।' যৌবনবেদনায় উন্মত্ত রাধার অধীরতা কৃষ্ণ নিজে বুঝেছিল, সেজন্য রাধার অনুরোধে বড়ায়ি গিয়ে কৃষ্ণকে নিয়ে এলে সে-ও যেভাবে রাধার সঙ্গে বাক্য - বিনিময় করেছে তাতে দেখা যায় কৃষ্ণ রাধার মদনপীড়াটি যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে, নইলে সে বিদ্রুপ

করে নপুংসক আইহনের কথা তুলে বলতো না- 'ঘরে গিআঁ সেব তোহ্মে আইহন পতী'। একথা বলার সময়, অনুমান কর া যায়, কৃষ্ণের মুখে কুটিল হাসি ভেসে উঠেছিল। রাধার দেহসর্বস্ব কামনা এবার রাধার নিজের উক্তিতে কীভাবে ফুটে উঠেছে সেটি দেখা যাক। নীচের উদাহরণগুলো লক্ষ কন। 'আয়িস ল বড়ায়ি রাখাহ পরাণ / সহিতেঁ নারোঁ মনমতবাণ', 'ঝাট করি কাহাঞি আনাওঁ/ রতি মুখে রজনী পোহাও', পীন কঠিন উচ তনে / কাহাঞি পাইলেঁ দিবোঁ আলিঙ্গনে', 'উন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ' - এরকম যৌবন - বেদনা - রসে বিহ্বল অজস্র উক্তি। রাধাবিরহের ৬৭ টি পদের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটি পদে 'যৌবন' ও 'সুরতী' শব্দ দুটি ব্যবহার করে কবি বুঝিয়ে দিয়েছে নদেহকামনা কেমন করে বেষ্টন করে আছে এই ভরন্ত যুবতীকে। কৃষ্ণ তাহলে এই নারীরই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, দেহে কামনার সঞ্চার ঘটিয়ে সুযোগ বুঝে পা লিয়ে গিয়েছে - এটা নিশ্চয়ই সামাজিক ও নৈতিক অপরাধ। কিন্তু এরই পাশাপাশি ভাবতে হবে আর একটি কথাও। বড়া য়ির দৌত্যে রাধার আত্যন্তিক কামবেদনাকে দূর করতে কৃষ্ণ আরো একবার বৃন্দাবনে ফিরে এসেছিল, নিষ্ঠুর হয়েও পুরে াপুরি নির্মম হতে পারেনি। সেখানে কি রাধা সম্পর্কে তার কোন ইতিবাচক ভাবনা ছিল না? রাধার সঙ্গে এবারও তার দেহ মিলন হয়, কিন্তু এখানে যেন নিজের গরজের তুলনায় রাধার মনোবাঞ্ছা পুরণের ব্যাপারটাই প্রধান। কবি লিখছেনঃ 'আল কাহ করিল সুরতী / পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী'। মিলন কালে তো বটেই মিলনের পরেও কৃষ্ণের কয়েকটি অ াচরণ যেন অপ্রত্যাশিত। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ স্থানত্যাগ করেন না, রাধার অনুরোধে রতিক্লান্ত সঙ্গিনীকে পরিচর্যা করেঃ 'নব কিশলয়ত শয্যা রচিল। নিজ উতলে তাক নিশ্চলে রাখিল।' নিদ্রিতা রাধার যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সে জন্যও কৃষ্ণের কত আয়াস। বড়ায়ির কাছে গিয়ে সে-যে - কথা বলে তাতে জানা যায়, রাধার সঙ্গে তার এ মিলন কেবল বড়ায়ির কথা রক্ষার খাতিরে ('পালিল বড়ায়ি আহ্মে বচন তোহ্মারে')। অবশেষে বড়াইয়ের উপর অর্পণ করে যায় রাধার রক্ষণ াবেক্ষণের ভারঃ 'সাঁঝ উপসন্ন ভৈল বনের ভিতরে / রাধা লঞাঁ ঝাট বিনএ যাহ ঘরে।..... আর বচনেরক বোলোঁ সুন ল বড়ায়ি ধরিঞাঁ তোর করে / তাক রাখিহ যতনে আ পণ অন্তরে জাইবো আহ্মে মথুরা নগরে।' চাকিতে প্র জাগে, কামুক কৃষ্ণের মধ্যে এ দায়িত্ববোধ, কর্তব্যবুদ্ধি কে সঞ্চারিত করে দিল? না কি এ অনুতাপের ফল, লোক দেখানো কর্তব্যবোধ ? রাধাকে ছেড়ে কৃষ্ণের চলে যাওয়াটা অমানবিক হতে পারে, কিন্তু রাধাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া কিংবা রাধার অনুরোধে বৃন্দ াবনে চিরতরে থেকে যাওয়াটা ছিল গল্পের দিক থেকে আরো ভয়াবহ। কৃষ্ণকেন্দ্রিক কোন পুরাণে কিংবা লোকগল্পে এই অসম্ভব ঘটনা প্রদর্শিত হয়নি। তাই বড়ু কবিকে এইখানে গোঁজামিল দিতে হয়েছে। রাধার প্রতি ত্রমশ প্রসন্ন দরদী ম ানুষটির মুখ দিয়ে বড়ু চণ্ডীদাসকে অনর্থক বলিয়ে নিতে হয়েছেঃ

আগ বড়ায়ি বাহুড়ী যাহ তথী।
রাধিকা লাগিআঁ মোক না কর শকতী।।
কাটিল ঘাঅত লেম্বুরস দেহ কত।
তোহ্মার বিদিত মোরে রাধা বুইল যত।।
এ ধন বসতী সব তেজিবাক পারী।
দুসহ বচন তাপ না সহে মুরারী।।
মথুরা আইলা হোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাস।।

তাহলে ভোগক্লান্ত পুষের অচিবিকারজনিত কামিনী পরিত্যাগ নয়, কংস হত্যার গুতর দায়িত্ব নিয়ে কৃষ্ণ চলে এসেছে মথুরায়, রাধাকে রাখতে চেয়েছে বৃদ্ধা বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে - যা অন্যান্য পুষদের ক্ষেত্রেও কখনো কখনো দেখা গেছে। স াদৃশ্য সুত্রে মনে পড়ে যায়, লাহনার কাছে খুল্লনাকে রেখে ধনপতি সওদাগরের দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্য যাত্রার কথা।

তবু প্রবঞ্চকের অপবাদ থেকে কৃষ্ণকে মুক্তি দেওয়া যায় না, কারণ সে রাধাকে তার সমাজ - সংসার - সতীত্ববোধ থেকে উৎখাত করে সঙ্গিবিহীন জীবনের চরম হতাশার অন্ধকারে নিক্ষেপ করেছে। তার অপরাধ অমার্জনীয়। আর এখানেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ যেন হঠাৎ সমীকৃত হয়ে যায় সেকালের সমান্ততান্ত্রিক পুষ শাসিত সমাজের ব্যভিচার - দুষ্ট পুষের সঙ্গে - যারা এভাবেই নারী লাঞ্ছিত করেছে, কেড়ে নিয়েছে তার নিজস্ব সম্পদ, সামাজিক বলদর্পিতায় নিপিষ্ট করেছে ন ারীর স্বাধীন সত্তা। এই সামাজিক ছবিটাই যেন চকিতে ফুটে ওঠে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পে। রাধা আর কৃষ্ণের পৌরাণিক

ঐতিহ্য যুক্ত নাম দুটো মন থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই সারা কাহিনীতে যেন অনুভব করা যাবে পঞ্চদশ শতকে বাঙালি সমাজকে। বুঝতে পারি, বড়ু কবি আসলে তাঁর কালের ধৃষ্ট কামুক পুষ ও লাঞ্ছিতা নারীর কথাই বলতে চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যে, কেবল কালের অনুরোধে তাঁকে টেনে নিতে হয়েছে ধর্মের বর্ম। ধর্মের এই অনাবশ্যক লেজটুকু খসে পড়লেই ব্যাঙাচি হয়ে উঠতো ব্যাঙ - কৃষ্ণকথা পরিণত হতে পারতো বিশুদ্ধ মানব - কথাতে - বাঙালি পাঠক সেদিনই লাভ করতে পারতো আধুনিক সাহিত্যের স্বাদ। কেননা আধুনিক সাহিত্যের অভিযাত্রা ধর্মপ্রভাব বিমুক্ত উজ্জ্বল মানবতার পথে।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com